জ্ঞানবিদ্যায় জ্ঞানের উৎপত্তি, শর্ত, স্বরূপ, সীমা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। মূল্যবিদ্যায় আমাদের জীবনের তিনটি পরমাদর্শের—সত্য, শিব (কল্যাণ) ও সুন্দরের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করা হয়। কাজেই বলতে হয় যে, জ্ঞানবিদ্যা ও মূল্যবিদ্যার মতো অধিবিদ্যাও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সমগ্র দর্শন নয়।

২.৩ অধিবিদ্যা কি সম্ভব? (Is Metaphysics possible ?)

অধিবিদ্যা বস্তুর বাহ্যরূপ (appearance) বা অবভাসিকরূপ এবং আন্তররূপ বা বস্তুস্বরূপের (Reality) মধ্যে পার্থক্য করে। সাধারণ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানেও অনেক সময় প্রত্যক্ষগোচর বস্তুর বাহ্যরূপ ও তার স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। দুটি সমান্তরাল রেললাইনকে আমরা মিলিত হতে দেখি, জলে অর্ধ-নিমজ্জিত সোজা ছড়িকে বাঁকা দেখি; ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীকে নিশ্চল দেখি; দূর দিগন্তে আকাশকে মাটি স্পর্শ করতে দেখি। আমরা বলি—এসবই বস্তুর প্রকাশিত রূপ, আসলে সমান্তরাল রেখা কোথাও মিলিত হয় না, জলে অর্ধ-নিমজ্জিত ছড়ি বেঁকে যায় না, পৃথিবী কোনদিন স্থির নয়, আকাশ কখনও মাটি স্পর্শ করে না।

সাধারণজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে অধিবিদ্যার পার্থক্য হল—অবভাস ও বস্তুস্বরূপের মধ্যে পার্থক্যকে অধিবিদ্যায় অভিজ্ঞতার সর্বস্তরে প্রসারিত করা হয়; অর্থাৎ **সাধারণজ্ঞান ও বিজ্ঞানে যাকে বস্তুর আসলরূপ বলা হয়, অধিবিদ্যায় তাকেও অবভাসিতরূপ বলা হয়।** অধিবিদ্যায় অভিজ্ঞতার বিষয় মাত্রই অবভাস। জলে অর্ধ-নিমজ্জিত বাঁকা ছড়ি যেমন অবভাস, সোজা ছড়িটিও তেমনি অবভাস, কেননা উভয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার বিষয়। অধিবিদ্যার লক্ষ্য হল—অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য জগৎ ও জীবনের অন্তরালে যে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুস্বরূপের জগৎ, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা।

সঙ্গতভাবেই এখানে যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হল—অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য জগতের অন্তরালবর্তী যে সদ্‌বস্তুর জগতের উল্লেখ করা হয়, তার কোন বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি? থাকলে, তাকে জানা মানুষের সাধ্যায়ত্ত কি? এই প্রশ্নের সদুত্তরের ওপর নির্ভর করে অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দার্শনিকরা অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ প্রাচীন দার্শনিকগণ, এমনকি দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইব্‌নিজ প্রমুখ আধুনিককালের পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোন সংশয় প্রকাশ করেননি। এঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, যাবতীয় মানব-অভিজ্ঞতার অন্তরালে যে পরমতত্ত্ব সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা মনুষ্যবুদ্ধির পক্ষে সম্ভবপর।

কিন্তু আধুনিক যুগের এবং সাম্প্রতিককালের অনেক দার্শনিক অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ, বিশেষ করে **ডেভিড হিউম (Hume) অধিবিদ্যা-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছেন।** হিউমের মতে, জ্ঞান হল ধারণার অনুষঙ্গ এবং ধারণার ভিত্তি হল মুদ্রণ বা সংবেদন। কাজেই, আমাদের জ্ঞান কখনও মুদ্রণ বা সংবেদনের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। জ্ঞানের অন্তর্গত ধারণা-মাত্রকেই মুদ্রণ-ভিত্তিক হতে হবে। কোন ধারণা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিলে তাই আমাদের

Scanned with CamScanner

জানতে হবে—সেই ধারণাটির পেছনে কোন মুদ্রণ বা সংবেদন আছে কি না। ধারণাটি মুদ্রণ-ভিত্তিক হলে তাকে গ্রহণ করা যাবে, আর মুদ্রণ-ভিত্তিক না হলে তাকে বাতিল করতে হবে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে হিউম ঈশ্বর, আত্মা, জড়দ্রব্য, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ প্রভৃতি অধিবিদ্যক ধারণাকে বাতিল করেছেন, কেননা এসব ধারণার ভিত্তিস্বরূপ কোন ইন্দ্রিয়ানুভবকে নির্দেশ করা যায় না। অধিবিদ্যক উক্তির কোন তত্ত্বগত বা তথ্যগত মূল্য নেই। হিউম আমাদের সমগ্র জ্ঞানকে দুটি মাত্র শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন—'তথ্য-সংক্রান্ত জ্ঞান' (knowledge about matters of fact) এবং 'ধারণার পারস্পরিক সম্বন্ধ-সংক্রান্ত জ্ঞান' (knowledge about relations of ideas)। প্রথম প্রকার জ্ঞান অভিজ্ঞতাভিত্তিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ, পূর্বতসিদ্ধ। যুক্তিশাস্ত্র ও গাণিতিক জ্ঞান দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অধিবিদ্যক জ্ঞান এই দু-প্রকার জ্ঞানের কোনটির অন্তর্গত না হওয়ায় অধিবিদ্যক বচনের কোন জ্ঞানগত মূল্য নেই।

জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant)-ও অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কান্ট তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির যুগ্ম প্রক্রিয়ায় আমরা কেবল বস্তুর অবভাসকেই (appearance) জানতে পারি, বস্তুস্বরূপ (Reality) আমাদের জ্ঞানগম্য হয় না। পরিদৃশ্যমান জগতের উৎসমূল যে বস্তুস্বরূপের জগৎ, তাকে স্বরূপে এবং অবিকৃতরূপে জানা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। স্বয়ং-সদ্বস্তুকে স্বরূপে জানতে হলে তার থেকে সৃষ্ট সংবেদনরাশিকে অবিকৃতরূপে জানতে হয়। কিন্তু আমাদের মনের গঠনই এমন যে, ইন্দ্রিয়-পথ দিয়ে যেসব উপাত্ত (sense-data) আমাদের মনে উপস্থিত হয়, আমরা তাদের মনের আকার (forms) ও প্রকারে (categories) মণ্ডিত না করে, বিকৃত না করে জানতে পারি না। মানসিক উত্তেজনার কারণস্বরূপ বস্তুজগৎ অস্তিত্বশীল হলেও, মনের আকার ও প্রকার প্রয়োগ করে যে জগৎকে আমরা জানি তা আমাদের মনেরই রচনা। কবির ভাষায়, "আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছি তাহারে রচনা"। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের জগৎ বাহ্যসদ্বস্তুর অবভাস মাত্র। এজন্য কান্ট বলেছেন, সত্য বা সত্তা অস্তিত্বশীল হলেও তা মানবমনের কাছে চিরদিন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত থেকে যায়।

প্রত্যক্ষ্যবাদী (Positivist) কোঁৎ-ও (Comet) অধিবিদ্যাকে অসার ও অর্থহীন বলেছেন। বলা যায় যে, হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ ও কান্টের অবভাসবাদ থেকেই কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ-সম্মত দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে। কোঁতের মতে, যা বাস্তব (positive fact) ও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, কেবল তাই হবে দর্শনের আলোচ্য বিষয়। প্রত্যক্ষগোচর বিষয়ের অন্তরালে যদি কিছু থাকেও, তাকে জানবার প্রচেষ্টা অর্থহীন,—অনুভবগম্য নয় এমন অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুসন্ধানের কোন সার্থকতা নেই। এজন্য কোঁৎ তাঁর ধর্মদর্শনে ধর্মকেই মেনেছেন, যেহেতু তা বাস্তব; কিন্তু ধর্মের তথাকথিত ঈশ্বর-প্রকল্পটিকে অগ্রাহ্য করেছেন। আদিম কাল থেকে অদ্যাবধি ধর্মভাবাপন্ন হয়ে মানুষ ধর্মানুষ্ঠান করে চলেছে—এ-বিষয়ে কোন সংশয় নেই ; কিন্তু ধর্মের তথাকথিত ঈশ্বর কোন বাস্তব বিষয় নয়, তা হচ্ছে মনুষ্যমনের এক কল্পিত চিত্র মাত্র। প্রত্যক্ষবাদী কোঁৎ এজন্য তাঁর ধর্মদর্শনে মানবত্ব বা মানবতাকেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন—আদর্শমানুষ (Ideal Man) বা মানবতাকেই মানুষ এযাবৎ ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করে

Scanned with CamScanner

চলেছে। এ-ভাবে কোঁৎ তার দর্শন-আলোচনাকে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বাস্তব বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

সাম্প্রতিক কালের ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীগণ (Logical positivists) ভাষাবিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে অধিবিদ্যাকে অসার ও অর্থহীন প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। অভিজ্ঞতাবাদী হিউমের মতো এয়ারও (Ayer) দু-প্রকার অর্থপূর্ণ বচনের উল্লেখ করেছেন—(১) অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ (a-posteriori) তথ্য-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বচন এবং (২) অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ (a-priori) বচন। দ্বিতীয় প্রকার বচনের সত্যতা বাক্যের অন্তর্গত শব্দার্থের ওপর নির্ভর করে, সত্যতা নির্ণয়ের জন্য যাচাইয়ের (verification) প্রয়োজন হয় না। প্রথম প্রকার বচনের অর্থ নির্ভর করে বচনটির যাচাই হওয়ার ওপর। অধিবিদ্যক বচন এই দু-প্রকার বচনের কোনটিরও অন্তর্গত নয় বলে তা অর্থহীন বচনাভাস (Pseudo statement) মাত্র।

বিজ্ঞানমনস্ক ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীদের মূল লক্ষ্য হল, বৈজ্ঞানিক বচন-সমূহকে অর্থপূর্ণরূপে এবং অধিবিদ্যক বচনকে অর্থহীনরূপে প্রতিষ্ঠা করা। হিউম অথবা কান্টের মতো অবশ্য ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীরা এমন বলেন না যে সত্ত্ব বা তত্ত্ব মানুষের জ্ঞানগম্য নয়; ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীরা যা বলেন তা হচ্ছে, তত্ত্ব-সংক্রান্ত বচনমাত্রই অর্থহীন। তারা ভাষা-বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে তত্ত্ববিদ্যাকে আসার পতিপন্ন করেন। এদের অভিমত হল, তথ্য-সংক্রান্ত বচনমাত্রই সত্য হবে অথবা মিথ্যা হবে। সত্য নয় আবার মিথ্যা নয়, এমন বচন অর্থহীন। ন্যায়গত প্রত্যবাদীদের 'অর্থের যাচাইকরণ তত্ত্ব' (verification theory of meaning) অনুসারে, কোন তথ্যজ্ঞাপক বচনের অর্থ নির্ভর করে তার যাচাইযোগ্যতার ওপর। যে সব বচনকে প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করা যায় না বা যাদের যাচাইযোগ্যতা নেই, সে-সব বচন অর্থহীন। 'আকাশ নীল' বচনটি অর্থপূর্ণ, কেননা প্রত্যক্ষ অনুভবের মাধ্যমে তা যাচাই করা যায়। তেমনি, 'আকাশ সবুজ' বচনটিও অর্থপূর্ণ কেননা প্রত্যক্ষ অনুভবের মাধ্যমে তার মিথ্যাত্ব যাচাই করা যায়। কিন্তু 'পরমসদ্বস্তু বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে'—অধিবিদ্যক এই বচনটি যাচাই করার কোন উপায় নেই। পরমসদ্বস্তু সম্পর্কে যেমন আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অনুভব নেই, তেমনি তার অভিব্যক্ত হওয়াকে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভবে পাই না। কাজেই, যাচাইতত্ত্ব অনুসারে পরমসত্তা সংক্রান্ত অধিবিদ্যক বচনটিকে সত্য অথবা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না, তাকে অর্থহীন বলতে হয়। এ-প্রকার অধিবিদ্যক বচনমাত্রই অর্থহীন।

সাম্প্রতিককালে অবভাসবাদী হুসার্লও (Hysserl) অধিবিদ্যাকে আমাদের জীবনে নিষ্প্রয়োজনীয় বলেছেন। হুসার্লের মতে, আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ, অবভাসিত জগৎই একমাত্র জগৎ; এর অন্তরালবর্তী এক অজ্ঞানগম্য সদ্বস্তুর জগতের স্বীকৃতি এক ভিত্তিহীন স্বীকৃতিমাত্র। হুসার্লের মতে, দার্শনিকের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে, দর্শনকে সকল প্রকার পূর্বস্বীকৃতি (pre-supposition) থেকে মুক্ত করা। অবভাসবাদী হুসার্লের কাছে অবভাসই নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্তাবান; কেননা বস্তুরূপের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করা গেলেও যে জগৎ আমার কাছে অবভাসিত হচ্ছে তার সম্পর্কে কোন সংশয় প্রকাশ করা যায় না। অবভাসই আমার জগৎ। যখন আমি একটি টেবিল দেখি, এবং বলি যে 'টেবিল দেখছি', তখন জিনিসটা

Scanned with CamScanner

টেবিল কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে; কিন্তু অবভাসিক টেবিল বা Phenomenon টেবিল সম্পর্কে আমার কোন সংশয় থাকে না। কাজেই, হুসার্লের মতে, অবভাসই নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সত্য। আসলে, হুসার্ল মনে করেন, অবভাস (Phenomenon) ও সত্তার (Reality) মধ্যে কোন ভেদ নেই, যেহেতু অবভাস-অতিরিক্ত আর কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। দর্শনের আলোচনা তাই অবভাসিক জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সমালোচনা : **(Criticism)**

অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা নানাভাবে সমালোচিত হলেও তত্ত্ববিদ্যাকে, তত্ত্ববিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে, কোনভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম অধিবিদ্যা-বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করলেও আসলে তা যুক্তিহীন অধিবিদ্যার বিরুদ্ধেই প্রকাশ করেছেন। যুক্তিযুক্ত অধিবিদ্যা যে মানবজীবনে বিশেষভাবে মূল্যবান, তা যে সমুদয় বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক হতে পারে, Enquiry গ্রন্থে হিউম সে কথা বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। হিউমের অনেক টীকাকার হিউমকে অধিবিদ্যার-বিরোধীরূপে অভিমত প্রকাশ করলেও, আসলে হিউম যুক্তিনিষ্ঠ অধিবিদ্যার বিরোধিতা করেননি।

কান্ট তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে যদিও এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে—বস্তুসত্তা (Reality) থাকলেও তা আমাদের জ্ঞানগম্য হতে পারে না, আমাদের মনের আকার ও প্রকারের মাধ্যমে আমরা যা জানি তা বস্তুর অবভাসিক রূপ মাত্র,—তথাপি কান্ট এ-কথা স্বীকার করেছেন যে, তত্ত্ব-অনুসন্ধান বিচারশীল মানুষের জীবনে এক অনিবার্য ও আবশ্যিক প্রয়াস। কান্ট নিজেও তত্ত্বালোচনা থেকে বিরত থাকতে পারেননি। মনের আকার ও প্রকারের স্বরূপ উৎঘাটনে কান্ট যে-সব জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন তা আসলে তত্ত্বেরই আলোচনা।

কোঁৎ তাঁর প্রত্যক্ষবাদে যে অধিবিদ্যা-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা যুক্তিসম্মত হয়নি। কোঁতের উদ্ধৃতি দিয়েই বিষয়টি বোঝানো যায়। কোঁৎ বলেন, "আমরা **কেবলমাত্র প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যাপৃত থাকব।**" এখানে "কেবলমাত্র" শব্দটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা কথাটি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগতের অন্তরালবর্তী এক ইন্দ্রিয়াতীত জগতের অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে ইন্দ্রিয়াতীত জগতের প্রতি ইঙ্গিত করা হলে মানুষের বুদ্ধিময় জীবন সেই জগতের আলোচনা থেকে কখনই বিরত থাকতে পারে না। সহজ কথায়, তত্ত্ব-আলোচনাকে মানুষ কোনভাবেই পরিহার করতে পারে না।

ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীদের 'বচনের অর্থকরণের মানদণ্ডটি'ও আসলে ত্রুটিপূর্ণ। শুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানের (Pure physics) এমন অনেক বচন আছে (যথা—ইলেকট্রন-প্রোটন সংক্রান্ত বচন) যাদের ইন্দ্রিয়বেদ্যতার মাধ্যমে যাচাই করা যায় না। কাজেই অর্থের যাচাইকরণ তত্ত্বটি স্বীকার করলে বিজ্ঞানের অনেক অর্থপূর্ণ বচনকেই অর্থহীন বলে পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীদের লক্ষ্য হচ্ছে, বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করা এবং পরাবিদ্যাকে অসার প্রতিপন্ন করা। এই অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীদের অনেকে তাঁদের যাচাইকরণ তত্ত্বটিকে সম্প্রসারিত করে বলেন,—'যাচাই' বলতে বাস্তবত যাচাই বোঝায় না,

Scanned with CamScanner

বোঝায় যাচাই-যোগ্যতা (possibility of verification)। এই সংশোধনবাদীদের মতে, কোন বচন বাস্তবে যাচাই করা না গেলও তাকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে যদি সেই বচনটি এমন হয় যে, কিরূপ অবস্থায় বচনটি যাচাই করা যেতে পারে তা আমাদের জানা থাকে। কিন্তু যাচাইকরণ তত্ত্বের এ-প্রকার সম্প্রসারিত অর্থ করলে কেবল বৈজ্ঞানিক বচনগুলিই অর্থপূর্ণরূপে সমাদৃত হয় না, অধিবিদ্যক সমুদয় বচন অর্থপূর্ণরূপে গ্রাহ্য হয়, যেহেতু সম্প্রসারিত অর্থে সে-সব বচনেরও যাচাইযোগ্যতা থাকে। কাজেই অধিবিদ্যক বচনকে কোনভাবেই অর্থহীন বলা যায় না; পরন্তু একথাই বলতে হয় যে "অধিবিদ্যা হচ্ছে অর্থহীন, এই কথাটিই হচ্ছে অর্থহীন'—"To say that Metaphysics is nonsense, is nonsense."

২.৪. জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology)

দর্শনের একটি বিভাগের নাম 'Epistemology,' বাংলায় যার প্রতিশব্দ হচ্ছে 'জ্ঞানবিদ্যা'। "Episteme" শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' আর "Logos" শব্দের অর্থ 'বিদ্যা'। কাজেই 'Epistemology' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'জ্ঞান-সংক্রান্ত বিদ্যা' বা 'জ্ঞানবিদ্যা'। **দর্শন যেখানে সমগ্র মানব-অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করে, দর্শনের একটি মুখ্য বিভাগ সেখানে তার আলোচনাকে কেবল জ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই—জ্ঞানের স্বরূপ, শর্ত, উৎস, পরিধি, সম্ভাব্যতা ইত্যাদির আলোচনার মধ্যেই, আবদ্ধ রাখে। দর্শনের এই বিভাগটিকেই বলা হয় 'Epistemology' বা 'জ্ঞানবিদ্যা'।** জ্ঞানবিদ্যা হল জ্ঞানের উৎস, শর্ত, সীমা, সম্ভাব্যতা ইত্যাদি জ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক আলোচনা।

তবে, দর্শনে 'জ্ঞানবিদ্যা' বলতে যে-কোন জ্ঞান-সংক্রান্ত আলোচনাকে বোঝায় না। মনোবিজ্ঞানেও (Psychology) জ্ঞানের আলোচনা হয়। মনোবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান বিভাগ আছে—জ্ঞান-বিষয়ক মনোবিদ্যা, অনুভূতি-বিষয়ক মনোবিদ্যা এবং ইচ্ছা-বিষয়ক মনোবিদ্যা। জ্ঞান-বিষয়ক মনোবিদ্যায় মূলত জ্ঞানের আলোচনা হলেও তা জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) থেকে স্বতন্ত্র। জ্ঞান-বিষয়ক মনোবিদ্যায় জ্ঞানরূপ বিষয়টি সম্পর্কে কোন সংশয় প্রকাশ করা হয় না, পরন্তু আমাদের জ্ঞান যে বাস্তবিক সম্ভব—এটা নির্বিচারে মেনে নেওয়া হয়। মনোবিদ্যার এই বিভাগের মুখ্য প্রতিপাদ্য হল—সরলতম মানসবৃত্তি সংবেদন (Sensation) নানান স্তরের মধ্য দিয়ে কিভাবে জটিল জ্ঞানে পরিণত হয়, তা নির্দেশ করা।

জ্ঞানবিদ্যার (Epistemology) প্রশ্নটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির। **জ্ঞানবিদ্যায় জ্ঞানের সম্ভাবনাকে নির্বিচারে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে জ্ঞানরূপ বিষয়টি আদৌ সম্ভব কি-না—এমন প্রশ্ন করা হয়।** জ্ঞান সম্ভব হলে, সেই জ্ঞানের স্বরূপ কি? জ্ঞানের শর্তাবলী কি কি? কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ করলে বলা যাবে যে, জ্ঞান হয়েছে? জ্ঞানের উৎস কি? জ্ঞান কি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পথ দিয়ে আসে অথবা বুদ্ধির পথ দিয়ে আসে, অথবা জ্ঞানের অন্য কোন মাধ্যম আছে? জ্ঞান সত্য হয়েছে কি-না তা কিভাবে জানা যাবে, অর্থাৎ সত্যতার পরীক্ষা কি? এসব প্রশ্ন জ্ঞানবিদ্যার প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে জ্ঞান বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করে তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়, বিজ্ঞানের বাহ্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যা সম্ভব হয় না। এ-জাতীয় আলোচনা দার্শনিক আলোচনা, মনোবিদ্যক আলোচনা নয়।

Scanned with CamScanner